ইসলামের জন্ম, বিকাশ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র
আকাশ মালিক
(প্রকাশিতব্য বইয়ের একটি প্রবন্ধ)

পুর্ব প্রকাশিতের পর-

পাঁচ বছর পর হিজরি পঁচিশ সনের কথা। ইতিমধ্যে উসমান (রাঃ) কর্তৃক আমর ইবনুল আস (রাঃ) মিশরের শাসন কর্তৃত্ব হতে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেছেন। গ্রিক সম্রাট কনস্টানটাইন, এক বছরের মধ্যে শুধু আলেকজান্দ্রিয়া থেকে দখলদার মুসলিমদিগকে বিতাড়িত করেননি, সমগ্র মিশরকেও মুসলিম শাসনমুক্ত করে ফেলেন। বিপদে পড়লেন খলিফা উসমান (রাঃ)। বাধ্য হয়ে সাহাবি আমর ইবনুল আসের (রাঃ) শরণাপন্ন হলেন এবং মিশর পুনরুদ্ধারের অনুরোধ জানালেন। প্রায় বিনা যুদ্ধেই আমর ইবনুল আস মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া পুনরায় মুসলমানদের দখলে নিয়ে আসেন। খলিফা উসমান বাধ্য হয়ে আমর ইবনুল আসকে মিশরের সেনাবাহিনী ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে দেন; কিন্তু গভর্নর থাকলেন আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ। মিশরে আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন আবু সারাহ (রাঃ) ও আমর ইবনুল আসের (রাঃ) দ্বৈত শাসন চললো। এই দুই সাহাবি একে অপরের চক্ষুশূল ছিলেন। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা একে অপরের ব্যাপারে পরষ্পর-বিরোধী নির্দেশ জারি করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটির তদন্তের দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং খলিফা উসমান। হজরত আবদুল্লাহ বিন সাদের অভিযোগ হলো : হজরত আমর ইবনুল আস গ্রিকদের সাথে যুদ্ধকালে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে, সাধারণ মানুষের বাড়িঘর লুন্ঠন করে প্রচুর মালামাল আত্মসাৎ করেছেন। অনেক গ্রিক নারীকে তাঁর ব্যক্তিগত দাসীরূপে রেখে দিয়েছেন এবং জনগণের কাছ থেকে জোরপূর্বক মাত্রাতিরিক্ত কর আদায় করছেন। পক্ষান্তরে আমর ইবনুল আসের (রাঃ) অভিযোগ হলো: আবদুল্লাহ বিন সা'দ (রাঃ) ঔদ্বত্যপূর্ণ ও রুক্ষ চরিত্রের মানুষ। তিনি নবীজির অভিশপ্ত লোক এবং কোরআনকে 'আল্লাহর বাণী' বলে বিশ্বাস করেন না। আবদুল্লাহ বিন সাদের ওপর আনীত শেষোক্ত অভিযোগ সম্বন্ধে সম্ভবত হজরত উসমানের চেয়ে বেশি কেউ জানতেন না। তিনি তাঁর দুধভাইকে তিনদিন নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে মুহাম্মদের (দঃ) কতলাদেশ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। খলিফা উসমান (রাঃ) বিচারে হজরত আমর ইবনুল আসকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে আবারো বহিষ্কার করে উসমান (রাঃ) যেন

সর্পের গুহায় হাত দিলেন। হজরত আমর ইবনুল আস, খলিফা উসমানের স্বজনপ্রীতিতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে সিংহের মতো গর্জে উঠলেন। তিনি সোজা মদিনায় চলে এলেন। এবার প্রতিশোধ গ্রহণের পালা। আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হলো।

মাত্র এক বৎসর হলো হজরত উসমান (রাঃ) ক্ষমতায় বসেছেন। এরই মধ্যে একদিকে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধ, অঙ্গরাজ্যের গভর্নরদের কর প্রদানে অনিয়ম, হাশিমি ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যকার তিক্ততা এবং সর্বোপরি মদিনায় খাদ্যাভাবে খলিফা ভীষণ চিন্তিত হলেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন সিরিয়ার গভর্নর হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ)। পরামর্শ দিলেন আর্মানিয়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এশিয়া মাইনর আক্রমণ করতে হবে। উসমান (রাঃ) ক্ষমতায় আরও কিছুদিন থাকার ভরসা পেলেন, অন্তত আয়ের একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেল; কারণ যুদ্ধ মা'নেই প্রচুর গনিমতের মাল অর্জন। হজরত মোয়াবিয়ার কথামতো খলিফা উসমান কুফার সালমান বিন রুবাইয়াকে আট হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হতে নির্দেশ দেন। আর্মানিয়ার পথে সেনাপতি সালমান (রাঃ) তাঁর দল নিয়ে সিরিয়া বাহিনীর সাথে মিলিত হন। পারস্য ও গ্রিসের মধ্যবর্তী পার্বত্যাঞ্চল আর্মানিয়া চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির দৃষ্টিগোচরে ছিল। আর্মানিয়ার স্বাধীনচেতা অধিবাসীদের কেউই বেশিদিন আবদ্ধ রাখতে পারেনি। এ দেশ পারস্য ও গ্রিস কর্তৃক বহুবার অধিকৃত হয়েছে। হজরত ওমরের (রাঃ) মুসলিম বাহিনী যখন গ্রিকদের হাত থেকে অঞ্চলটি দখল করে, তখনও আর্মানিয়াগণ জানতো, এ অধীনতা সাময়িক। খলিফা উসমানের সময়ে তারা মদিনায় কর পাঠানো বন্ধ করে দিল। হিজরি পঁচিশ সনের শেষের দিকে সিরিয়া ও ইরাকের সম্মিলিত বিরাট মুসলিম সেনাবাহিনী আর্মানিয়ার পর্বতমালা অতিক্রম করে তার অভ্যন্তরীণ মালভূমি এলাকায় এসে উপনীত হয়। ওমরের (রাঃ) মৃত্যুর পর মাত্র কিছুটা দিন আর্মানিয়ানগণ শান্তিতে ছিল। আবার 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো পাহাড়ি অঞ্চল। স্বাধীনচেতা আর্মানিয়ানগণ দেশমাতৃকার জন্যে অকাতরে জীবন দিতে পাহাড় বেয়ে নেমে আসলো। এক হাজার দিনের ক্ষুধার্ত সিংহের মতো তাঁদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো মুসলিম সৈন্যগণ। লোমহর্ষক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলিমদের তেজস্বী তলোয়ারের নিচে গলা পেতে দিল আর্মানিয়ার সহস্রাধিক তাজা প্রাণ। পাহাড়ের শ্বেতবর্ণের ঝর্ণারাশি রঙিন হলো আর্মানিয়ানদের রক্তের স্রোতধারায়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুন হারে কর দেবার শর্তে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো। আর্মানিয়া দখল করে মুসলিম সেনাবাহিনী স্বদেশে ফিরে গেলেন না। তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ পুরোদমে

চালিয়ে গেলেন। বিজয়ানন্দে উৎফুল্ল মুসলমানগণ অতি সহজেই আর্মানিয়ার পশ্চিম দিকে তিফলিশ নগরী দখল করে কৃষ্ণ-সাগর তীরে এসে পৌঁছিলেন। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে লেভান্ট শহর। এখানে গ্রিকদের সাথে তাদের তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলিম সৈন্যদের গতিরোধ করার মতো শক্তি সম্ভবত তখনকার পৃথিবীতে কারো ছিল না। সুতরাং তারা এখানেও জয়ী হলেন। দেশের পর দেশের, যুগ যুগান্তরের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন কৃষ্টি ও সনাতন সভ্যতা ধ্বংস করে মুসলমানগণ আত্মতৃপ্তি বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু কাসপিয়ান থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি, আরব জাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। হজরত ওমরের আমলের দখলকৃত কিছু কিছু এলাকায় তাঁর জীবিত থাকাকালেই বিদ্রোহ চলছিল। তন্মধ্যে পারস্যের বিদ্রোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হজরত ওমরের (রাঃ) যুগের পলাতক পারস্য সম্রাট ইয়াযদ্গার্দ খলিফা উসমানের শাসনকালে মুসলমানদের হাত থেকে স্বদেশ পুনুরুদ্ধারের প্রস্তুতি নিলেন। অষ্টাশি বছর বয়স্ক ইয়াযদ্গার্দকে ‘সিংহ-রূপী’ মুসলমানদের সম্মুখ হতে ‘মূষিক ছানা’র মতো পালিয়ে খোরাসানে আশ্রয় নিতে হলো। খোরাসান ছিল পারস্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এলাকা। হজরত উসমান (রাঃ) ঘোষণা দিলেন, যে আগে খোরাসানে প্রবেশ করতে পারবে, সেই হবে সেখানকার শাসনকর্তা। সুতরাং মুসলিম বাহিনী এলাকাটি দখল করে নিতে আর দেরি করলেন না। এ ছিল ছয়শত একান্ন খ্রিস্টাব্দের ঘটনা।

ভূমধ্যসাগর, পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলভাগ বিধৌত করায়, সাগরবক্ষ হতে উল্লিখিত দুই মহাদেশের উপকূলবর্তী জনপদসমূহের ওপর আক্রমণ করার স্বপ্ন হজরত মুয়াবিয়াকে (রাঃ) রাত দিন তাড়া করতো। রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব মেডিটারেনিয়ান এলাকায় অবস্থিত সাইপ্রাস দ্বীপটি দখলের অভিপ্রায় তাঁর বহুদিনের। হজরত ওমরের (রাঃ) সময়ে মুয়াবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস, পাকিস্তান (তখনকার সময়ের ভারতবর্ষ) ও ভারতের কিছু সমৃদ্ধ অঞ্চল দখল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হজরত ওমর তাঁর সেনাপতি আমর ইবনুল আসের (রাঃ) পরামর্শে হজরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। খলিফা উসমানের (রাঃ) কাছে হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) আবার সাইপ্রাস দ্বীপ দখলের প্রস্তাব পাঠালেন। জলযুদ্ধে মুসলিমদের অদক্ষতার কথা স্মরণ করে খলিফা উসমান সংকিত হলেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার (রাঃ) সাইপ্রাস দখলের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। যুদ্ধের অনুমতি দিলেন সত্য, তবে একটি ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন। উসমান (রাঃ) তাঁর খেলাফতের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছেন : বিগত অনেক যুদ্ধে বিভিন্ন এলাকার অমুসলিম, পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত কিছুকিছু লোক

শুধুমাত্র যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁর বিশ্বাস এরা সঙ্গবদ্ধ হয়ে একদিন ইসলামের খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করবে। খলিফার এই বিশ্বাস মোটেই অমূলক ছিল না। ইসলামের ইতিহাস, সাধারণ মানুষের মনে এই বিশ্বাসেরই জন্ম দিয়েছিল যে যুদ্ধই জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়।

অনুমতি পেয়ে হজরত মুয়াবিয়া সারা দেশে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সৈনিক আহ্বান করলেন। জলযুদ্ধের প্রশিক্ষণ শুরু হলো। রাজধানীতে মানুষ দলে দলে সৈনিকের খাতায় নাম লেখানোর তোড়জোড় পড়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই বিরাট শক্তিশালী নৌ-বহর গড়ে উঠলো। হজরত আবদুল্লাহ বিন-কায়েস আল্ হারেসির নেতৃত্বে আল্লাহর নাম নিয়ে, হিজরি আটাশ সনে মুসলিম বাহিনী সাইপ্রাস উপকূলে এসে পৌঁছে। গ্রিক নৌ-বাহিনীর সাথে পরদিন শুরু হলো ভয়াবহ যুদ্ধ। প্রথম দিনের যুদ্ধেই মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন-কায়েস (রাঃ) তীরবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হলেন। খবর পেয়ে মদিনায় খলিফা উসমান চিন্তিত হলেন। তাড়াতাড়ি মিশরের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন সাদকে (রাঃ) সাইপ্রাস অভিমুখে সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দেন। মিশর থেকে হজরত আবদুল্লাহ বিন সাদ সৈন্য নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে গেল। অল্পদিন পরে মিশর ও সিরিয়ার সম্মিলিত নৌ-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে গ্রিকবাহিনী পরাজয় বরণ করে। বুদ্ধিমান-বিচক্ষণ মুয়াবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস অধিবাসীগণের ওপর জিজিয়া কর ধার্য না করে রাষ্ট্রের ওপর বার্ষিক ৭০ হাজার দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) কর আরোপ করেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাতে ছেড়ে দেন। মুয়াবিয়ার পরামর্শে হজরত আবদুল্লাহ বিন সাদ নৌ-বহর বোঝাই করে যুদ্ধলব্ধ মাল নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন-কায়েস (রাঃ) অন্য একটি যুদ্ধে মারা যান। জীবিতকালে হজরত আবদুল্লাহ বিন-কায়েস (রাঃ) কমপক্ষে ৫০টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যুদ্ধলব্ধ বাড়তি সম্পদও আসতে থাকলো। কিন্তু এই লুটের সম্পদ দেশের উন্নয়ন বা সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যবহার হলো না। ক্ষমতা ও সম্পদ দুটোই রইলো কোরায়েশদের হাতে। দিনদিন শাসক ও শোষিতের মধ্যকার বৈষম্য বাড়তেই থাকলো। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় সৈন্যগণ ধ্বংস ও লুটের কাজে লিপ্ত রইলো আর এদিকে রাজ্যের অভ্যন্তরে শাসকগণ ভোগবিলাসী রমরমা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। সিরিয়ার গভর্নর মোয়াবিয়া (রাঃ) যখন হজরত উসমানকে (রাঃ) আর্মানিয়া আক্রমণ করতে পরামর্শ দেন, প্রায় একই সময়ে মিশরের আবদুল্লাহ বিন সাদ (রাঃ) ত্রিপলি (বর্তমানে

লিবিয়ার রাজধানী) আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। আমর ইবনুল আসের (রাঃ) সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগে তাকে অপেক্ষা করতে হলো অনেকদিন। হজরত আবদুল্লাহ বিন সা'দ (রাঃ) ৬৫২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ত্রিপলি আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেন এবং উসমানকে (রাঃ) সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ জানান। উসমান (রাঃ) মদিনা থেকে একদল বিশেষ যোদ্ধা ত্রিপলি অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী। এক পর্যায়ে রণভঙ্গ দিয়ে মুসলিম সৈন্যগণ যখন পশ্চাদগমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই মদিনা থেকে আগত তেজস্বী বীর কোরায়েশ যোদ্ধা হজরত জোবায়ের (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন সা'দকে (রাঃ) একটি মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন : "মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ঘোষণা করা হউক, যে ব্যক্তি ত্রিপলির গভর্নর গ্রিগেরিয়াসের মাথা কেটে আনতে পারবে, তাঁকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও সেই সাথে গ্রিগেরিয়াসের সুন্দরী যুবতী কন্যা দান করা হবে"। যেই ঘোষণা সেই কাজ। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রিগেরিয়াসের মাথাটা দ্বিখণ্ডিত করে সেনাশিবিরে হাজির করা হলো। সাথে বন্দিনী সেই অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী গ্রিগেরিয়াসের বীরকন্যা, যিনি অস্ত্র হাতে সব সময় পিতার পাশে-পাশে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার বন্টনে মুসলিম সেনাপতির কোনো অসুবিধা হয়নি, সমস্যাটা হলো সেই মেয়েকে নিয়ে। একটিমাত্র মেয়ের দিকে হা করে তৃষ্ণার্থ চোখে তাকিয়ে আছে এক পাল কাম ক্ষুধার্ত সৈন্য। রাজকন্যা নিজেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুয়রের মতে, গ্রিগেরিয়াসের বীরকন্যা পরাধীনতার চেয়ে মৃত্যুকেই স্বেচ্ছায় বরণ করে নেন। কোনো মুসলিম সৈন্যের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার আগেই তিনি আত্মহত্যা করেন।

ত্রিপলি যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যে বিপুল ধনরত্ন লাভ করেন, তা দেখে খলিফা উসমান (রাঃ) খুশিতে আত্মহারা হয়ে, বিজয়ী বীরনেতা আবদুল্লাহ বিন সাদকে (রাঃ) 'বীর উত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইতিপূর্বে কোনো যুদ্ধে এতো সম্পদ লাভ করা সম্ভব হয়নি। নিয়মানুযায়ী যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাজস্ব খাতে জমা হওয়ার কথা। প্রফুল্লতায় বিভোর উসমান (রাঃ) এই বিপুল সম্পদের প্রায় সবটুকুই আবদুল্লাহ বিন সাদকে ও তাঁর নিজস্ব মন্ত্রী মাওয়ানকে দিয়ে দেন। তবে এ ছাড়া খলিফার কোন উপায়ও ছিল না। বাইতুলমাল শূন্য রাষ্ট্র-পরিচালনায় যখন উসমান (রাঃ) হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন আর্মানিয়া ও ত্রিপলি যুদ্ধই তাঁর ক্ষমতায় টিকে থাকার একমাত্র সহায় ছিল। তাই খলিফা নিজেই ত্রিপলির যুদ্ধপূর্বে আবদুল্লাহ বিন সাদকে, যুদ্ধে জয়ী হলে এরূপ সম্পদ বন্টনের অঙ্গীকার করেছিলেন। বিষয়টা জনগণ প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারলো না। উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ বিন সাদ ও

মারওয়ান এরা দু-জনই ছিলেন উমাইয়া বংশীয় এবং খলিফা হজরত উসমানের (রাঃ) আত্মীয়। ত্রিপলি জয় করে মুসলিম সৈন্যদল আলজিরিয়া ও মরক্কো দখল করে নেয়। এবার মরক্কোর উত্তরে সমুদ্রের অপর পাড়ে ফুলে-ফলে ভরা শস্য-শ্যামলা তরুরাজি আচ্ছাদিত, লোভনীয় স্পেইন ভূমির ওপর তাদের দৃষ্টি পড়লো। সংবাদ পেয়ে খলিফা উসমান লোভ সামলাতে পারলেন না। তড়িঘড়ি করে মদিনা থেকে একদল সৈন্যসহ আব্দুল্লাহ বিন নাফে বিন হাসিন ও আব্দুল্লাহ বিন নাফে বিন আবদে কায়েস নামক দুজন পরাক্রমশালী যোদ্ধাকে স্পেইন অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। কোরায়েশ মরু-দস্যুরা তখনো জল-দস্যুতার দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। তাই সমুদ্র-পাড়ে এসে তারা স্পেইন দখলের আশা আপাতত ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। আবদুল্লাহ বিন সাদ যখন সাইপ্রাস উপকূলে জলযুদ্ধে ব্যস্ত, হজরত মুয়াবিয়া তখন স্থলযুদ্ধে কনস্টানটাইন দখল করতে বেরিয়ে পড়েন। কনস্টানটাইন দখল করতে মুয়াবিয়া (রাঃ) দু'বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কিন্তু ঐ বছরই তিনি আর্জরুম প্রদেশের অন্তর্গত হাস আল-মুরাত নামক এলাকাটি দখল করতে সক্ষম হন।

খলিফা উসমানের শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা কেমন ছিল তা জানার লক্ষ্যে এবারে কুফা ও বসোরার প্রতি একটু নজর দেয়া যাক। হজরত ওমরের (রাঃ) আমলে কুফার গভর্নর ছিলেন হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। খলিফা ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে একটি মহৎ কাজ করে গেলেন। সরকারি সম্পদের অপচয়কারী, চরম অমিতব্যয়ী মাত্রাতিরিক্ত সুখ-সম্ভোগ বিলাসী সাহাবি হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) কুফার গভর্নর পদ থেকে অপসারিত করে তাঁর স্থলে হজরত মুগিরা ইবনে শোবাকে (রাঃ) নিযুক্ত করেন। কিন্তু অভাগা সাধারণ কুফাবাসীর দুর্গতি দূর হলো না। হজরত মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) অত্যন্ত রুক্ষ-কঠোর ঔদ্বত্য ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের ছিলেন। তাঁর বৈষম্যমূলক অশ্লীল আচরণ, ব্যক্তিকেন্দ্রীক চরিত্র ও জনগণের প্রতি চরম অবজ্ঞার খবর খলিফা উসমানের (রা.) কানে পৌঁছিলে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে মুগিরা ইবনে শোবাকে (রাঃ) গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু জনগণকে হতাশ করে হজরত উসমান (রাঃ) আবার সেই সুখ-সম্ভোগ বিলাসী সাহাবি হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। হজরত সাদ (রাঃ) সুযোগ বুঝে পূর্বের চেয়েও অধিক বিলাসী হয়ে উঠলেন। শুধু তা-ই নয়, এবারে তিনি বাইতুলমাল থেকে বিপুল পরিমাণের সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে বসলেন। তখন বাইতুল-মালের কোষাধক্ষ্য ছিলেন সাহাবি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। উল্লেখ্য বর্তমান কুফার গভর্নর সাদ ইবনে

আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ইসলাম পূর্ব মক্কায় আকাবা ইবনে আবু মুইতের ছাগল রাখাল ছিলেন। বাইতুলমালের অর্থ নিয়ে গভর্নর ও কোষাধক্ষ্যের মধ্যে প্রবল মনোমালিন্য ও ঝগড়া হলো। একে অন্যের প্রতি গালাগালি, রূঢ় ব্যবহার এমন পর্যায়ে পৌঁছিল যে শেষ পর্যন্ত গভর্নরের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ, খলিফা উসমানের (রাঃ) দরবারে উপস্থাপিত করা হলো। বিচারে হজরত সাদ (রাঃ) দোষী সাব্যস্থ হলেন। এবারে কুফার গভর্নর পদে যিনি নিযুক্ত হলেন, তিনি হলেন খলিফা উসমানের (রাঃ) বৈপিত্রীয় ভাই, খ্যাতনামা বীর অলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ)। আগুন ধরে গেল কোরায়েশ-হাশিমী গোত্রের গায়ে। কুফার নব-নিযুক্ত শাসনকর্তা অলিদ ইবনে ওকাবা ছিলেন নবীজি মুহাম্মদের (দঃ) প্রাণের শত্রু ওকবার পুত্র। নবীজির সাথে একবার একটি ঘটনা কুফাবাসীর জানা ছিল : এক যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের হাতে ওকবা বন্দী হয়ে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ভরা সুরে নবীজিকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি (ওকবা) মারা গেলে তাঁর সন্তানগণ কি খাবে? উত্তরে নবীজি বলেছিলেন, দোজখের আগুন খাবে। সেই ওকবার ছেলে অলিদকে, অসৎ চরিত্রের লোক হিসেবে মানুষ আগে থেকেই জানতো। ক্রোধে, ঘৃণায় কুফাবাসী বারবার খলিফা উসমানের কাছে অভিযোগ করেও কোনো ফল পেলো না। অলিদের কঠোর দমননীতির সামনে সাধারণ মানুষ মাথানত করতে বাধ্য হলো। অন্যায়, অত্যাচার আর স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত সীমায় এসে হজরত অলিদ (রাঃ) একদিন জনতার ফাঁদে ধরা পড়ে যান। মদ্যপানে অভ্যস্ত, হজরত অলিদ (রাঃ) নেশাগ্রস্থ হয়ে একদিন এমনভাবে ঘুমিয়েছিলেন যে, কিছু লোক তাঁর হাতের আঙুল থেকে রাষ্ট্রীয় সীলযুক্ত একটি আংটি খুলে, অসৎ চরিত্রের প্রমাণস্বরূপ, মদিনায় খলিফার কাছে নিয়ে যায়। তাছাড়া তিনি একদিন নেশায় বিভোর হয়ে মসজিদে ইমামতির সময়ে ফজরের নামাজ, ফরজ দুই রাকাতের জায়গায় চার রাকাত পড়িয়েছেন বলেও তারা খলিফার কাছে অভিযোগ করে। এ নিয়ে সারা দেশে বিক্ষোভ ঠেকাতে খলিফা বাধ্য হয়ে হজরত অলিদকে পদচ্যুত করেন। এরপর থেকে হজরত অলিদ আর কোনোদিন খলিফা উসমানকে সুনজরে দেখেননি। এবার খলিফা উসমান কুফার মসনদে বসালেন কোরায়েশ বংশের তরুণ বীরযোদ্ধা হজরত সাইদ বিন আল আসকে। এই ব্যক্তির ভেতর কোরায়েশসুলভ অমানবিক, দুশ্চরিত্রের অভাব মোটেই ছিল না। কোরায়েশদের ঔদ্ধত্য, অহমিকা কুফাবাসীর জানা ছিল। আগের সকল শাসকের চেয়ে নতুন গভর্নর ভয়ানকরূপে প্রকাশ হলেন। তিনি স্থানীয় অমুসলিমতো দূরের কথা, অকোরায়েশ মুসলিমদেরকেও হীন মর্যাদার, পশুপ্রকৃতির বলে খলিফাকে পত্র দ্বারা অবহিত করলেন এবং বললেন, এদেরকে তিনি লৌহদণ্ড দিয়ে শায়েস্তা করবেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন, একমাত্র কোরায়েশবংশই সম্ভ্রান্ত, শালীন ও উচ্চমর্যাদার দাবি করতে

পারে। একটি বৈঠকে সাইদ বিন আল আস যখন বললেন : 'সোয়াদ উপত্যকাটি একচেটিয়া কোরায়েশ বংশের লোকদের জন্য রক্ষিত' উপস্থিত জনগণ সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠলো। তারা বললো : এই বিশাল মুসলিম-সাম্রাজ্য বিস্তারে কুফা ও বসোরাবাসীর অবদান ভুলে গেলে কোরায়েশদের ভালো হবে না। সারা দেশ জুড়ে গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো। মদিনায়, মিশরে, কুফায় সর্বত্র সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে শুধুই উমাইয়া বংশের লোক। যে হাশিমি বংশে মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম, যাঁর জন্ম না হলে ইসলাম জন্ম নিতো না, সেই হাশিমি গোত্র এমন আস্ফালন বরদাশত করবে কেন? তারা খলিফার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিতে থাকলো। এই বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত উসমান (রাঃ) কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। ইত্যবসরে বসোরার একটু খোঁজ নেয়া যাক।

(৫)

ইসলামের ইতিহাসের দুই বিশেষ ব্যক্তিত্ব হজরত হাসান বসোরি (রাঃ) ও হজরত রাবেয়া বসোরির (রাঃ) জন্মস্থান এই বসোরা। মুক্তবুদ্ধি চর্চার মুতাজিলা মতবাদও ইরাকের এই বসোরা হতে উদ্ভূত। রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে কুফার পরেই বসোরার স্থান। কুফা ইরাকের উত্তরাঞ্চলের ও বসোরা দক্ষিণাঞ্চলের রাজধানী ছিল। বসোরার শাসনকর্তা এখান থেকে দক্ষিণ পারস্য, বেলুচিস্তান ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত শাসন চালাতেন। কুয়েতের দক্ষিণাঞ্চলও বসোরার শাসনাধীন ছিল। হিজরি ২৪ সনে হজরত ওমর (রাঃ) সাহাবি হজরত আবু মুসা-আশআরিকে (রাঃ) বসোরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। একনাগাড়ে বহুদিন অন্যায়ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আবু মুসা-আশআরি হয়ে ওঠেন এক ভয়ানক আত্মম্ভরী স্বৈরশাসক। একটি এলাকা দখলের প্রস্তুতিকল্পে আবু মুসা-আশআরি মসজিদে জেহাদের ফজিলত বর্ণনাকালে বলেছিলেন যে, পায়ে হেঁটে জেহাদের ময়দানে গেলে প্রচুর সোয়াব অর্জন করা যায়। লোকে বললো, তাঁর কথায় মিথ্যাচার আর হটকারিতা আছে। পরদিন ভোর বেলা অবাক বিস্ময়ে সাধারণ জেহাদিগণ প্রত্যক্ষ করলো, গভর্নর আবু মুসা-আশআরি (রাঃ) রাজকীয় পোষাকে তেজী ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছেন। চল্লিশটি গাধা তাঁর যুদ্ধ-সরঞ্জাম বহন করছে। কিছু লোক তাঁর পথ রুখে দাঁড়ালো। আবু মুসা আশআরি (রাঃ) ঐ লোকদের নীচ, হীনমনা, বদজাত বলে ধমকালেন এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিলেন। পূর্বে তাঁর অসীম ক্ষমতার অহমিকা ও স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ট হয়ে জনগণ বিদ্রোহ করে বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

আবু মুসা (রাঃ) তাঁর আত্মীয়স্বজনদেরকে অত্যাধিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রাষ্ট্রকে, সুবিধা প্রাপ্ত ও সুবিধা বঞ্চিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলেন। সুবিধা বঞ্চিত দল সংগঠিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে মদিনা পর্যন্ত তাদের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। একটি নিশ্চিত গৃহযুদ্ধের লক্ষণ টের পেয়ে খলিফা উসমান (রাঃ) হিজরি ২৯ সনে, আবু মুসা-আশআরিকে (রাঃ) গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। গৃহযুদ্ধ ঠেকানো গেল কিন্তু বসোরাবাসীর দুঃখ দূর হলো না। এবারে বসোরার ক্ষমতায় বসলেন খলিফা উসমানের (রাঃ) মামাতো ভাই হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমির। এই লোকটি খালিদ বিন ওলিদ ও আমর ইবনুল আসের চেয়েও ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ছিলেন। ক্ষমতায় বসেই তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অ-কোরায়েশদের অধিকার নিষিদ্ধ করে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমির ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর অমানবিক কঠোর শাসননীতি সাধারণ মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে সমগ্র মুসলিমজগত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। কোরায়েশ বনাম অকোরায়েশ। একদিকে যেমন খলিফা উসমানের (রাঃ) রাজ্য-বিস্তার, বিভিন্ন দেশ-এলাকা দখল ও দখলকৃত এলাকায় বিদ্রোহ দমনকার্য চলতে থাকলো, অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে, হজরত উসমানের ক্ষমতাসীন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের (দঃ) হাশিমি বংশ, আরবদের বিরুদ্ধে অনারব, কোরায়েশদের বিরুদ্ধে অকোরায়েশ, শাসকের বিরুদ্ধে শোষিতের বেঁচে থাকার সংগ্রাম অব্যাহত রইলো।

হজরত উসমান কর্তৃক এ যাবৎ মিশর, কুফা ও বসোরার ক্ষমতাচ্যুত শাসকগণ যখন দলবদ্ধ হয়ে খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা করেন, উসমান (রাঃ) তখন বৃদ্ধ বয়সে ক্ষমতায় আরো কিছুদিন টিকে থাকার লক্ষ্যে, কোরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। সেই ওমরের (রাঃ) খুনী পুত্রের বিচার থেকে আজ পর্যন্ত প্রজাগণ খলিফা উসমানের রাষ্ট্র পরিচালনায় কোরআনের শরিয়া আইন অনুসরণের উদাহরণ দেখেনি। সুতরাং সঙ্গত কারণেই সাধারণ মানুষ খলিফার কোরআন সংকলনের উদ্যোগে সন্দিহান না হয়ে পারলো না। তবে হজরত উসমান তাঁর দুধভাই, মিশরের অধিপতি, আল্লাহর বাণী কোরআনের অলৌকিকত্বে অবিশ্বাসী, আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহকে (রাঃ) কোরআন সংকলন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করলেন না।

চলবে-